ঘাটশীলার পথে প্রান্তরে

—সুব্রত সাহাবসু

আজ বসেছি ভ্রমণকাহিনী লিখবার উদ্দেশ্যে। ভ্রমণ মানুষের নেশা, ভালোবাসায় জড়ানো সফর যাকে সঙ্গী করে অদেখা, অচেনা জায়গায় আনন্দে ভেসে বেড়ায় মন। আমাদের ভ্রমণ ছিল কাছেপিঠে সেই ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকা কয়েকটা দিন। বেরিয়ে পড়লাম স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঘাটশীলার উদ্দেশ্যে। ভোর রাতে বেরিয়ে অ্যাপজাত গাড়িতে চড়ে হাওড়া ব্রীজে উঠে গঙ্গাপ্রণাম সেরে গন্তব্য নতুন প্ল্যাটফর্ম। হাজারো মানুষের যাওয়া আসার ফাঁক গলে চোখে পড়ল ইস্পাত এক্সপ্রেসের সুদীর্ঘ চেহারাটা। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সকাল ৬.৩৮-এ ছাড়ল ট্রেন। যাদের কখনো দেখিনি এমনই একট্রেন মানুষের সঙ্গে গন্তব্যপথে যাত্রী এক আশ্চর্য সুখানুভূতি দেয় আমাকে। গরম চা, সিঙ্গারা, কত কি নিয়ে ফেরিওয়ালাদের ডাক দিয়ে যাওয়া, সঙ্গে আনা টিফিন বার করে রসিয়ে রসিয়ে খাওয়ার স্বাদ যেন জানান দেয়—চলেছি সুদূরপানে, কে আমাদের বাঁধবে। টুকরো টুকরো ভেসে আসা হাসি, গল্পের ফাঁকে ৩ ঘন্টা পার করে এসে গেল গন্তব্য ঘাটশীলা স্টেশন। একসঙ্গে লাগেজ নিয়ে নামবার হুড়োহুড়িতে এক কামরা মানুষ একাকার হয়ে গেল। ঘাটশীলায় নামার পর থেকেই মনের মধ্যে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবনাটা জারিত হয়ে আনন্দে ভরে উঠল। অটোতে উঠে সামান্য এক কিলোমিটার ধুলো ওড়া পথের শেষে রামকৃষ্ণ মিশন গেটে থামল গাড়ি। অটোর চারজনেই মিশনে থাকার অনুমতি নিয়ে এসেছি প্রায় একমাস আগে বুকিং করে। মিশনের স্বর্গীয় পরিবেশ শরীরের ক্লান্তি কাটিয়ে চাঙ্গা করে তুলল। দু'ধারে ফুলের বাগান, মন্দির পার হয়ে পিছনে অফিসঘরে যাবতীয় কাজকর্ম শেষ করার পর মহারাজের নির্দেশে সবাই একবাটি ফলপ্রসাদ পেলাম। গেস্টহাউসের চাবি নিয়ে ঘরের দিকে এগোনোর পথে একপাশে চোখে পড়ল মিশনের স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে আনন্দের সঙ্গে বড় হচ্ছে ওরা। ওদের ঘরে হয়তো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ এক সুন্দর জীবনের দিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। মানুষ সবকিছু থেকে শুধু নিজেদের লভ্যাংশটুকু আদায়ে ব্যস্ত থাকে, যা পায় না তা ক্ষতির তালিকায় চলে যায়। অথচ চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতিতে যে আনন্দ ছড়ানো রয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবিক চাওয়া পাওয়াযুক্ত আনন্দের কোন মিলই নেই। আর তা উপলব্ধি করতে পারি না বলেই মনের চাহিদা মেটে না।

গেস্টরুমের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামাঙ্কিত ঘর। পাশের দেওয়ালে মা, ঠাকুরের দেওয়াল জোড়া ছবি। দুপুরে প্রসাদ গ্রহণের পর একটু হাঁটতে বের হলাম। মন্দিরের উল্টোদিকে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। একজন কমবয়সী মহিলা তার বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে রয়েছেন। বাচ্চাটার মুখটা বড় মায়াময়। আমাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ওর মায়ের কাছে শুনলাম ও কথা বলতে পারে না। আমাদের আদর পেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিকালে চা খাবার পর আবার পথে। লালমাটির ধুলো ওড়া রাস্তা

দিয়ে দূরপাল্লার বাসের হর্ণ, সূর্যাস্তে বাড়ি ফেরা গরু, ছাগলের পাল, রাস্তার ধারে অল্প অল্প সবজি নিয়ে বসা আদিবাসী মানুষজনের জীবন দেখে বড় ইচ্ছা করছিল এই নির্লোভ, নিস্তরঙ্গ জীবনের স্বাদ নেওয়ার জন্য। ঘাটশীলা আসার মূল উদ্দেশ্য সাহিত্যিক প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলব্ধি মনে প্রাণে গ্রহণ করা। পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই বের হলাম গৌরীকুঞ্জের উদ্দেশ্যে। গাঢ় গোলাপী রঙের থোকা থোকা বুনো ফুলের মাঝখান দিয়ে, সারিবদ্ধভাবে চলে যাওয়া মহিষের পাল আর প্রচুর ছাগলছানার কলরব মনের কোণায় কোণায় প্রকৃতির রঙ লাগিয়ে রঙিন করে তুলল। গৌরীকুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণের রেখে যাওয়া নানা ব্যবহার্য জিনিষপত্র, লেখার পাণ্ডুলিপি দিয়ে সাজানো মিউজিয়ামের মধ্যে চোখ রেখে যেন ওনার স্পর্শ অনুভব করতে চাইলাম। পুকুরে ফুটে থাকা শালুকের রঙ, জলকলমীর বিছিয়ে থাকা সবুজের আবরণ, পথের ধারে ঢোলকলমী ছাড়াও হাজারো জংলী গাছের মধ্যে দিয়ে সরু পথ বেয়ে যখন আমরা হাঁটছিলাম তখন যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলছিলেন সেই পথের কবি। মন আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল। এই উপলব্ধি আমৃত্যু থেকে যাবে সঙ্গে। সন্ধ্যায় মঠে ঠাকুরের আরতি গান শুনে মনে শান্তি নিয়ে ফিরলাম ঘরে। পাশের কয়েকজনের সঙ্গে কিছু কথা, কিছু ভাব বিনিময় করে রাতের আহার সেরে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লাম কারণ পরদিন ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হবে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এই ভ্রমণ কেবলমাত্র বাইরের প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়ানো নয় এ যেন এক অন্তর্জাগতিক ভ্রমণ যা মনকে উচ্ছল আমোদপ্রমোদ থেকে দূরে সরিয়ে মনকে শান্ত, নির্মল আনন্দে ভরপুর কয়েকটা দিন উপহার দেওয়া।